খাজানগরে অবস্থিত চাতাল ও রাইস মিল ঃ কর্মপদ্ধতি, সমস্যা এবং সমাধান

রহমত ছিদ্দিকী*

১. ভূমিকা

প্রধান খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই ধান উৎপাদন করা হয় এবং এদেশের প্রতিটি মানুষই ধান থেকে চাল তৈরী প্রক্রিয়ার সাথে কমবেশী পরিচিত। এখনও গ্রাম-বাংলায় প্রতিদিন হাজার হাজার মন ধান ঢেঁকিতে ভাঙ্গানো হয়ে থাকে। গ্রামের অনেকেই ঢেঁকিতে ধান ভেনে বিক্রি করাকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। আজকাল অনেক গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকার কারণে বিদ্যুৎ-চালিত রাইস মিল স্থাপিত হয়েছে এবং এর ফলে ধান ভানার কাজে ঢেঁকির ব্যবহার অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

ধান ভাঙ্গানোর আগে তাকে প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য পানিতে ভিজিয়ে সিদ্ধ করে রোদে ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হয়। গ্রামে পরিবারভিত্তিক ধান সিদ্ধ সনাতন পদ্ধতিতেই[১] সম্পাদিত হয়ে থাকে। প্রতিটি পরিবারে ব্যবহৃত ধানের পরিমাণ আলাদা আলাদাভাবে কম বলে পানি ও উত্তাপের সাহায্যে তৈরী গ্যাসের মাধ্যমে সেগুলোকে সিদ্ধ করার উদ্যোগ গৃহীত হয় না। কেবলমাত্র বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাল উৎপাদনের রাইস মিলগুলোতে পানি ও উত্তাপের সাহায্যে সৃষ্ট গ্যাসের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে বাণিজ্যিক উদ্দ্যেশে গ্যাসের মাধ্যমে ধান প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এমনি একটি ধান প্রক্রিয়াজাতকরণ ও চাল উৎপাদন কেন্দ্র কুষ্টিয়া জেলার খাজানগর গ্রামে গড়ে উঠেছে যার নাম খাজানগরের চাতাল[২]। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় খাজানগরের চাল রপ্তানি করা হচ্ছে। প্রতি বছরই এখানে নতুন নতুন রাইস মিল স্থাপিত হচ্ছে এবং এতে উক্ত কেন্দ্রের চাল উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এখানে ধান প্রক্রিয়াজাতকরণের চাতাল ও রাইস মিলের সংখ্যা ১০৮টি।

নিম্নলিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে এ প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে ঃ

ক) খাজানগরে আগত লোকেরা কেন ধান ভাঙ্গানো ও চাল বিক্রয়ের কাজটিকে নিজেদের পেশা হিসাবে গ্রহণ করলো তার সঠিক কারণ ও ইতিহাস উদ্ঘাটন।

খ) এখানকার চাতাল ও রাইস মিলগুলোর ধান সিদ্ধ, ধান ভাঙ্গানো ও চাল বাছাই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উদ্ঘাটন এবং তাদের কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ।

---

* অর্থনীতি বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া।

গ) চাতাল ও রাইস মিলগুলোর কর্মপ্রক্রিয়ায় সমস্যা ও সমস্যাসমূহের কারণ উদ্ঘাটন এবং সমস্যাগুলো সমাধানকল্পে সুপারিশমালা প্রণয়ন।

এই গবেষণা-কর্মের প্রায় সব তথ্য প্রাথমিক উৎস থেকে সংগৃহীত এবং প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে গবেষক সাক্ষাৎকার পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। চিলমারী ইউনিয়নের বর্তমান অধিবাসী, খাজানগরের অধিবাসী, চাতাল শ্রমিক[৩], মিল শ্রমিক[৪], চাতাল ও মিল মালিক প্রভৃতি শ্রেণীর লোকজনকে সাক্ষাৎকারের আওতায় আনা হয়েছে। গবেষণার আংশিক তথ্য চাতাল ও মিল মালিকদের পুরাতন ও নতুন খাতা-পত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এসব দিক বিচারে বর্তমান গবেষণা-কর্মটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় প্রকার তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

চিত্র ১ : খাজানগরের চাতাল ও রাইস মিলগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান

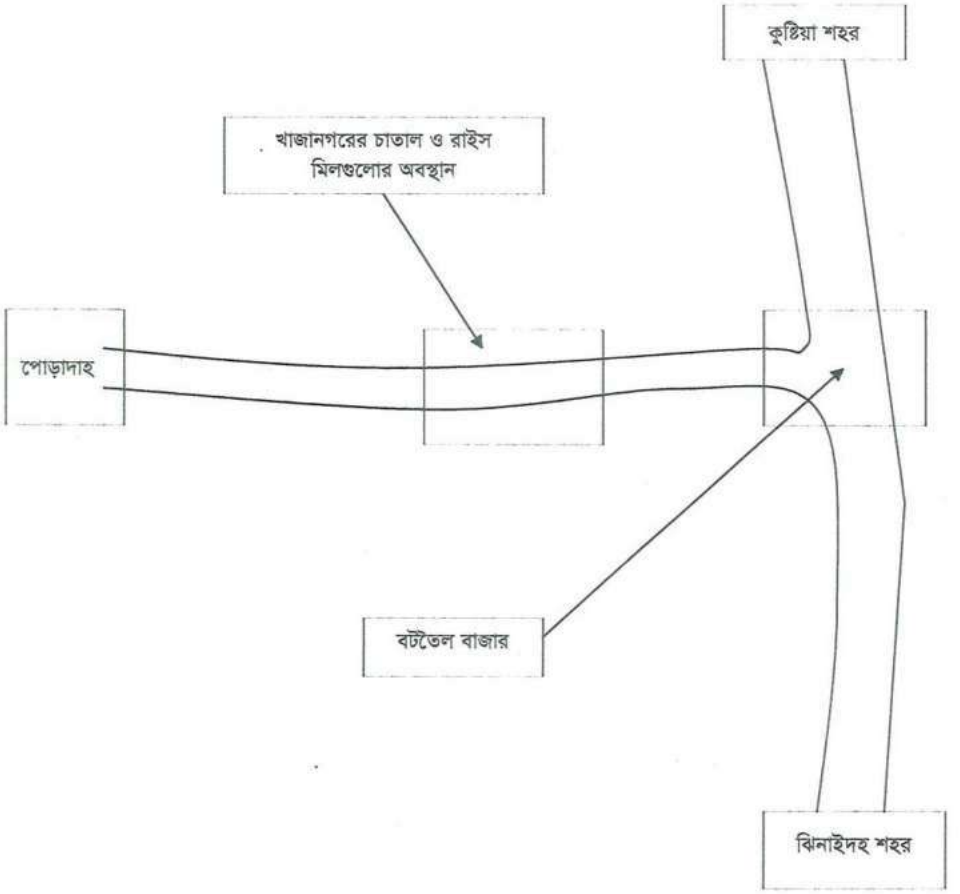

২. চাতাল ও রাইস মিলগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান

কুষ্টিয়া শহর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদাহ মহাসড়ক সংলগ্ন বটতৈল একটি বাজার এলাকা। বটতৈল থেকে পোড়াদাহের দূরত্ব ১০ কিলোমিটারের মত। বটতৈল এবং পোড়াদাহের প্রায়

মাঝামাঝি স্থানে খাজানগর নামে গ্রামটির অবস্থান। বটতৈল-পোড়াদাহ সড়কের খাজানগর গ্রামের প্রায় সম্পূর্ণ এলাকা জুড়ে উক্ত সড়কের দুই ধার দিয়ে ধান সিদ্ধ করার চাতাল ও ধান ভাঙ্গানোর রাইস মিলগুলো অবস্থিত। অন্যভাবে বলা যায়, পোড়াদাহ রেলজংশনের ৬ কিলোমিটার পূর্বদিকে এবং বটতৈল বাজারের ৪ কিলোমিটার পশ্চিমদিকে এই চাতাল ও রাইস মিলগুলো অবস্থিত। নীচে মানচিত্রের মাধ্যমে খাজানগরের অবস্থান দেখানো হলো ঃ

৩. খাজানগরের রাইস মিলগুলোর ইতিহাস[৩]

খাজানগর গ্রামের যে এলাকায় বর্তমানে রাইস মিলগুলো অবস্থিত সেটি ১৯৭২ সালের পূর্ব পর্যন্ত খাজানগর মাঠ হিসাবে পরিচিত ছিল। এই মাঠের মধ্যে মাত্র তিনটি পরিবার বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতো। মাটি উর্বর থাকায় বিস্তীর্ণ মাঠে ধান, পাট ও গমসহ বিভিন্ন ধরণের ফসল উৎপাদিত হতো। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত খাজানগর মাঠে কোনো চাতাল ছিল না। ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে 'খাজানগর রাইস মিল' নামে প্রথম একটি রাইস মিল এখানে স্থাপিত হয়। এই মিলের মালিক দৌলতপুর থানার (কুষ্টিয়া) ৬ নং চিলমারী ইউনিয়নের অধিবাসী।

৩.১ রাইস মিলগুলো খাজানগরে স্থাপিত হওয়ার কারণ

দৌলতপুর থানার (কুষ্টিয়া) ৬ নং চিলমারী ইউনিয়ন পদ্মা নদীর একেবারে তীরে অবস্থিত। ১৯৭১ সাল থেকে চিলমারী ইউনিয়নে ব্যাপক নদী-ভাঙ্গন শুরু হয়। ১৯৭১ সালের পূর্বে এ ইউনিয়নের সম্পূর্ণ অংশই পদ্মা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। '৭১ সালে পদ্মা নদীর পানি অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে নদী-ভাঙ্গনের মাত্রা অন্যান্য বছরের তুলনায় বেড়ে যায়। এর ফলে চিলমারী ইউনিয়নের একাংশ নদীগহ্বরে তলিয়ে যায় এবং তার সামান্য অংশ পদ্মা নদীর উত্তর পারে জেগে উঠে। তাই '৭১ সালের শেষ ভাগ থেকে চিলমারী ইউনিয়নের একাংশ পদ্মা নদীর তীরে অবস্থান করতে থাকে। এ সময় উক্ত ইউনিয়নের কিছু সংখ্যক বিত্তশালী লোক ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে চিলমারী থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত খাজানগর মাঠে বেশ কিছু জমি ক্রয় করে। সে সময় খাজানগর এলাকায় মাঠান জমির দাম খুবই কম ছিল। এই থেকে শুরু হয় চিলমারী ইউনিয়নের লোকদের খাজানগর এলাকায় আনাগোনা।

১৯৭১ সাল থেকেই চিলমারী ইউনিয়নের অধিবাসীরা অনুধাবন করতে সমর্থ হয় যে, আগামী চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই হয়তো বা সম্পূর্ণ ইউনিয়নটি নদীগর্ভে তলিয়ে যাবে। সে কারণেই ১৯৭২ ও '৭৩ সালে চিলমারী এলাকা থেকে ব্যাপক হারে লোকজন খাজানগর মাঠ এলাকায় এসে পাড়ি জমায় এবং তাদের সামর্থ অনুযায়ী এখানে বসতি স্থাপন করে। ফলে খাজানগর মাঠ ক্রমে ক্রমে হয়ে ওঠে বসতিপূর্ণ। এরপর প্রতি বছরই চিলমারী ইউনিয়নের কিছু কিছু অংশ নদী ভাঙ্গনে তলিয়ে যেতে থাকে এবং তা উত্তর পাড়ে জেগে ওঠে। '৭৪ সাল থেকে অদ্যাবধি সম্পূর্ণ চিলমারী ইউনিয়নটি নদীর উত্তর তীরে অবস্থান করছে।

চিলমারী ইউনিয়নের উত্তরে নাটোর ও রাজশাহী অবস্থিত। সেখানে গিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করা কঠিন হবে বলে বাস্তুহারা অসহায় মানুষগুলো মনে করেছিল। পাবনা ও কুষ্টিয়া শহরও তাদের জন্য সহজ বাসযোগ্য হবে না বলে তারা ধারণা করে। অবশেষে খাজানগরের অপেক্ষাকৃত সস্তা মাঠকেই তাদের উপযুক্ত স্থান হিসাবে বেছে নেয়। বর্তমানে চিলমারী ইউনিয়নে জনবসতী খুবই কম। কারণ বেশীর ভাগ

চিত্র ২ : চিলমারী ইউনিয়নের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান

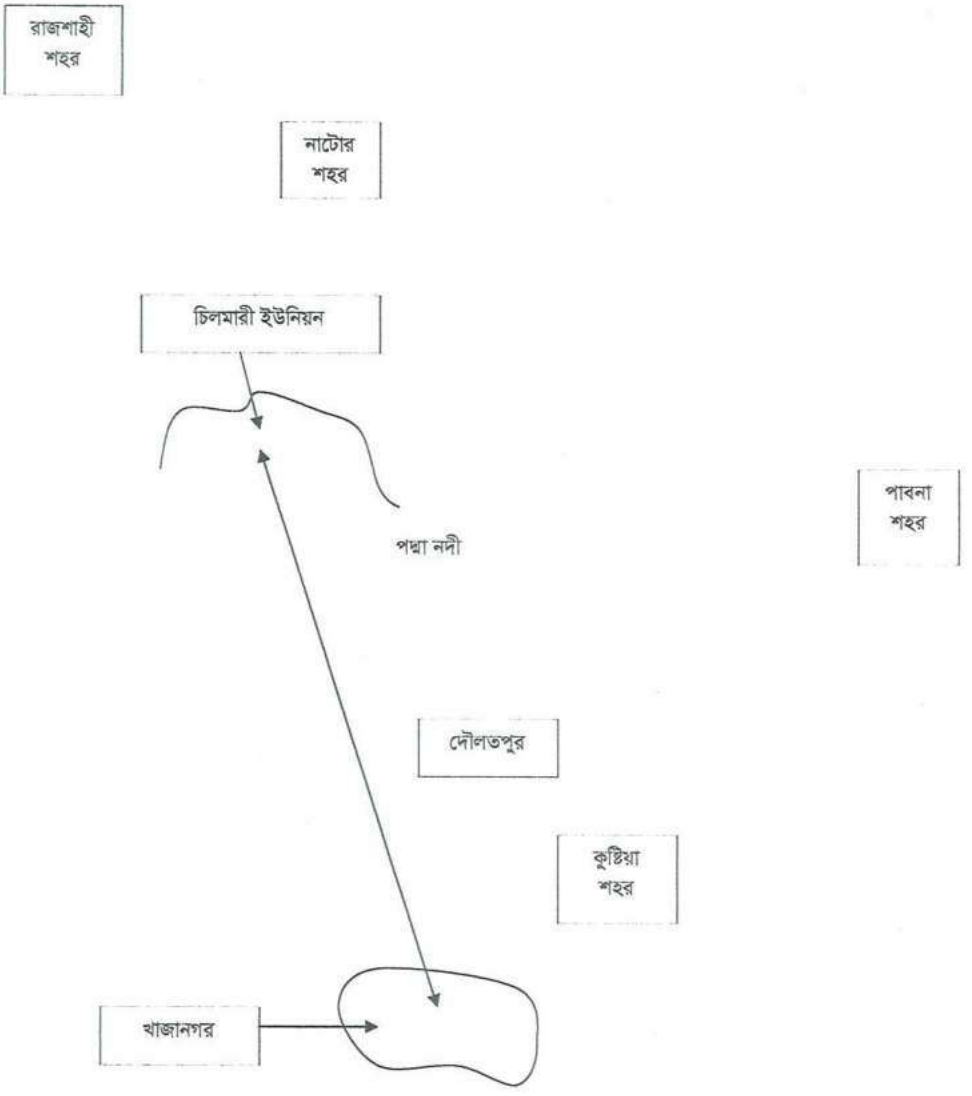

লোকই সপরিবারে খাজানগরে এসে হাজির হয়েছে। অপর পৃষ্ঠায় মানচিত্রের মধ্যমে চিলমারী ইউনিয়নের বর্তমান অবস্থান প্রদর্শন করা হলো ঃ

৩.২ ধান ভাঙ্গানো ও চাউল বিক্রয়ের কাজ বেছে নেয়ার কারণ

১৯৭৫ সাল নাগাদ চিলমারী অঞ্চল থেকে খাজানগর এলাকায় মোট আগত লোকের সংখ্যা দাঁড়ায় দু হাজারেরও উর্ধ্বে। জীবন ও জীবিকার তাগিদে তাদের শতকরা ৯৫ ভাগই বেছে নেয় ধান ভাঙ্গানো ও

চাউল বিক্রয়ের কাজ। 'প্রায় সবাই কেন এই পেশা গ্রহণ করলো' এ প্রশ্নের জবাবে নিম্নলিখিত উত্তরগুলো পাওয়া গেছে ঃ

(ক) চিলমারী থেকে আগত লোকদের কাছে খুব সামান্য পুঁজিই ছিল যা দিয়ে বড় ধরণের কোন ব্যবসা শুরু করা ছিল অসম্ভব।

(খ) ধান ভাঙ্গিয়ে চাল বিক্রি করার ব্যবসা বেশ লাভজনক এবং এই ব্যবসার কাজে পরিবারের সব ধরণের সদস্যকেই জড়িত করা যায়।[৬]

(গ) খাজানগরের নিকটবর্তী হাট-বাজারগুলোতে (পোড়াদাহ বাজার, উজানগ্রামের হাট, বিত্তিপাড়ার বাজার, বটতৈল বাজার) চালের পর্যাপ্ত চাহিদা ছিল। হাট-বাজার ছাড়াও গ্রামের বাড়ীতে বাড়ীতে গামালা[৭] করে প্রচুর পরিমাণ চাল বিক্রয় করা সম্ভব হতো।

(ঘ) নদী-ভাঙ্গন অঞ্চলের লোকেরা প্রকৃতিগতভাবেই বলিষ্ঠ ও কর্মঠ হয়ে থাকে। তাই চিলমারী অঞ্চল থেকে আগত এই লোকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বীয় ভাগ্য উন্নয়নের ব্যাপারে তারা ছিল বদ্ধপরিকর।

৩.৩ পেশার ক্রমবিকাশ

১৯৭২ সাল থেকেই তারা চালের ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়ে। তখন তাদের প্রতি পরিবারের গড় পুঁজির পরিমাণ ছিল ৪২০ টাকা। প্রতিদিন গড়ে প্রতিটি পরিবার ২ মন ধান ভাঙ্গাতো। এতে প্রতিটি পরিবারের গড় লাভের পরিমাণ দাঁড়াতো ৫০ টাকা (তুষ ও গুড়ো চাল বাদে)। ধান আশেপাশের হাট-বাজার থেকে মাথায় অথবা সাইকেলে করে কিনে আনা হতো এবং তা মাথায় বা সাইকেলে করে বিক্রয় করতে নিয়ে যাওয়া হতো। ১৯৭৩-৭৪ সালে তাদের ব্যবসার আয়তন বৃদ্ধি পায়। তখন ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই 'ভাড়া করা'[৮] ভ্যান ও ঘোড়ার গাড়ীতে করে ধান-চাল বহন আরম্ভ করে। এত পরিমাণ ধান ঢেঁকিতে ভাঙ্গানো অসম্ভব বলে তারা পোড়াদাহের রাইস মিলে ধান ভাঙ্গানো শুরু করে। এর পরবর্তী বছরগুলোতে ব্যবসায়ের আয়তন আরো দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাই ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে খাজানগরে 'খাজানগর রাইস মিল' নামে প্রথম একটি ধান ভাঙ্গানো মিল স্থাপিত হয়। এরপর '৭৯ সালে 'আরব আলী রাইস মিল' নামে আরো একটি মিল বসে। '৮০ সালে খাজানগরে মোট রাইস মিলের সংখ্যা অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়ে সাতটিতে উন্নীত হয়।[৯] '৮১ সালের পর থেকে মিলের সংখ্যা প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায় এবং বর্তমানে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০৮টিতে।

৪. চাতাল

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধান ক্রয় করে আনার পর ভাব দেয়া[১০], সিদ্ধ করা ও শুকানোর যাবতীয় কাজ চাতালের অধীনে হয়ে থাকে। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এই কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের শতকরা ৯০ ভাগই ছিল মহিলা[১১] প্রত্যেক চাতালে খুব বেশী হলেও ৩ থেকে ৪ জন পুরুষ শ্রমিক কাজ করত। বর্তমানে চাতালের নারী ও পুরুষ শ্রমিকের অনুপাত ৩ ঃ ২। চাতালের গড় কর্মচারীর সংখ্যা ১৮ জন। তবে নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত নিয়োজিত কর্মচারীর সংখ্যা বেশী থাকে। কারণ এ সময় চাতালে কাজের চাপ সব থেকে বেশী।

চিত্র ৩ : চাতালে গ্যাস তৈরী ও ধান সিদ্ধ করার প্রক্রিয়া

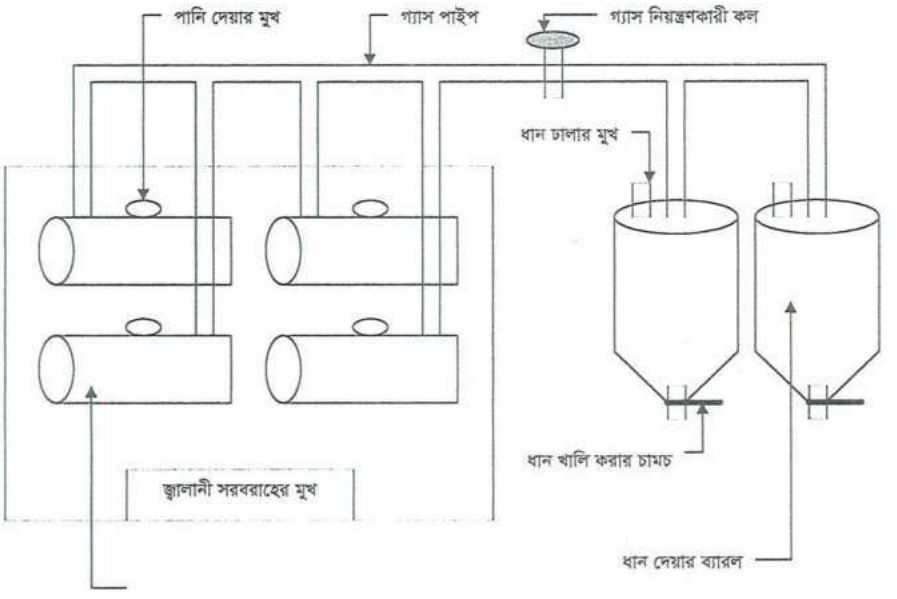

৪.১ চাতালের আওতাভুক্ত কর্মসমূহ

নিম্নলিখিত কাজগুলো চাতালের আওতায় পড়ে ঃ

ধান ঝেড়ে বা উড়িয়ে পরিষ্কার করা;

- সেগুলোকে যথা সময়ে ভাব দেয়া;
- ভাব দেয়া ধান সিদ্ধ করার জন্য ভেজানো;
- ভেজানো ধান সিদ্ধ করা;
- সিদ্ধ ধান বহন করে পাকা আঙ্গিনায় নিয়ে যাওয়া এবং সেগুলোকে ভালোভাবে শুকানোর ব্যবস্থা করা;
- বর্ষা-বাদল থেকে আঙ্গিনার ধান রক্ষা করা ও ধান যথাযথভাবে শুকিয়ে ঘরে ওঠানো[১২] গ্যাস তৈরীর জন্য জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত তুষ মিল থেকে নিয়ে আসা এবং সেগুলো পরিমাণমত ব্যবহার করে নির্দিষ্ট উত্তাপের আগুন তৈরী করা।

৪.২ চাতালের গ্যাস তৈরী পদ্ধতি

গ্রাম বাংলায় সাধারণতঃ সরাসরি আগুনের তাপে ধান সিদ্ধ করা হয়। এতে সময় লাগে বেশী এবং তাই জ্বালানী খরচ হয় অত্যধিক। সরাসরি আগুনের তাপে ধান সিদ্ধ করার আরেকটি বড় অসুবিধা হলো, একটু তাপ বেশী হলেই ধান পুড়ে গিয়ে হাঁড়ি বা কড়াইয়ের নীচে লেগে যায়। তা ছাড়া গ্যাসের সাহায্যে চাতালগুলোতে যেভাবে হাজার হাজার মন ধান বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সিদ্ধ করা হচ্ছে সরাসরি আগুনের

তাপে এত ধান কোথাও সেভাবে সিদ্ধ করা হয় না। নীচে চিত্রের সাহায্যে চাতালের গ্যাস তৈরীর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হল ঃ

প্রত্যেক চাতালে মাটির সমান্তরাল অপেক্ষা ৪ ফুট উঁচু করে ৪টি ব্যারল পাশাপাশি বসানো হয়। ব্যারলের নীচের দিকে জ্বালানী সরবরাহ করার সুবিধার্থে একটি ফাঁকা স্থান রাখা হয়। জ্বলানী হিসেবে সাধারণতঃ এখানে ধানের তুষ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কারণ তুষ ব্যবহার করে যে আগুন সৃষ্টি করা হয় তা সার্বক্ষণিক মোটামুটি সমানভাবে তাপ প্রদান করে যা ধানে ভাব দেয়া ও ধান সিদ্ধ করার জন্য খুবই উপযোগী। তাছাড়া ধান ভাঙ্গানো থেকেই এই তুষ পাওয়া যায় বলে জ্বালানী হিসেবে এর ব্যবহারে এক দিকে যেমন চড়া দামে কাঠ বা কয়লা ক্রয় থেকে রেহাই পাওয়া যায়, তেমনি অন্য দিকে জ্বালানী সংক্রান্ত পরিবহন ব্যয় একেবারে হয় না বললেই চলে।

প্রতেকটি ব্যারলের ওপরের দিকে পানি ঢালার জন্য মুখ থাকে।[১৩] পানি ঢালার পর সেগুলোকে ভালভাবে এঁটে দেয়া হয় যাতে সৃষ্ট গ্যাস বাইরে বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি ব্যারলের ওপরের অংশ 'গ্যাস পাইপ'-এর সাথে সংযুক্ত থাকে যাতে সৃষ্ট গ্যাস ঐ পথে বেরিয়ে যেতে পারে। গ্যাস পাইপের প্রান্ত সাধারণতঃ দুটি 'ধান দেয়ার ব্যারল'-এর ওপরের দিকে সংযুক্ত থাকে। নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিমাণমত গ্যাস সরবরাহ করার জন্য গ্যাস পাইপে একটি 'নিয়ন্ত্রণকারী কল' লাগানো হয়। ভাব দেয়া বা সিদ্ধ করা ধান ব্যারল থেকে বের করার জন্য 'ধান খালি করার চামচ' ব্যবহৃত হয়।[১৪] গ্যাস তৈরী ও সরবরাহ সঠিকভাবে হচ্ছে কি-না তা যে ব্যক্তি তত্ত্বাবধান করে তাকে চাতাল মিস্ত্রী বলে। প্রতেক চাতালে একজন করে চাতাল মিস্ত্রী থাকে।

৪.৩ ধান সিদ্ধ প্রক্রিয়া

ধান সিদ্ধ করার আগে সেগুলোকে ভালভাবে ঝেড়ে বা উড়িয়ে পরিষ্কার করে নেয়া হয়। প্রতি চাতালের ধান প্রথমেই ভাব দেয়া হয়। প্রতি চাতালের 'ধান দেয়ার ব্যারল' দুটিতে প্রতিবার ৬ মন করে ধান দেয়া হয়। এই ৬ মন ধান ভাব দিতে সময় লাগে ১০ থেকে ১২ মিনিট। ভাব দেয়া শেষ হলে ধান খালি করার চামচ সরিয়ে সম্পূর্ণ ধান বের করে আবার নতুন করে ৬ মন ধান ভাব দেয়ার জন্য ওপর দিক থেকে ঢেলে দেয়া হয়। ভাব দেয়া ধান পাশের পাকা পুকুরে[১৫] ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখা হয়। ২৪ ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পর সেই ধান পুকুর থেকে উঠিয়ে সিদ্ধ করার জন্য আবার ব্যারলে ঢালা হয়। ভাব দেয়ার মত সিদ্ধ করতেও ১০ থেকে ১২ মিনিট সময় লাগে। অতঃপর সিদ্ধ ধান পাকা মাঠে ছড়িয়ে দিয়ে শুকিয়ে ঘরে তোলা হয়। এই প্রক্রিয়াজাত ধানকে ভাঙ্গানোর উপযোগী বলে গণ্য করা হয়।

৫. প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যা এবং সমাধানের উপায়

ক. সব মিলমালিকই বিদ্যুৎ-সমস্যাকে মিলের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। চাতালের কার্যক্রম বিদ্যুতের উপর তেমন নির্ভরশীল নয়।[১৬] কিন্তু ধান ভাঙ্গানোর জন্য মিলের কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল। বিদ্যুৎ না থাকলে প্রত্যেক মিলেই অবশ্য জেনারেটর ব্যবহৃত হয়। কিন্তু জেনারেটর ব্যবহার করলে তার খরচ পড়ে বেশী। এতে চাউলের দাম আংশিক হলেও বাড়ে। তাছাড়া জেনারেটর ব্যবহার করে মিলগুলো ২/৩ ঘন্টার বেশী সচল রাখা যায় না। বারবার বিদ্যুৎ-সমস্যার কবলে পড়লে চালের মান খারাপ আসে। অতি শক্তিশালী জেনারেটর ব্যবহার করতে পারলে অবশ্য মিলগুলো দীর্ঘক্ষণ চালু রাখা সম্ভব। কিন্তু এত শক্তিশালী জেনারেটরের ব্যয়ভার

মিলমালিকদের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয় এবং এতে চাল উৎপাদন খরচ আরো বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মিলমালিকগণ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ''বিদ্যুতের কোনো বিকল্প নেই; বিদ্যুতের বিকল্প বিদ্যুতই।''

ধান ভাঙ্গানোর কাজে মিলগুলোতে বর্তমানে যে 'অটো'[১৭] ব্যবহৃত হচ্ছে তা থেকে সর্বোচ্চ উৎপাদন পেতে হলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বর্তমানে চাল বাছায়ের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাকে এখানকার লোকেরা 'এ্যাগ্র'[১৮] বলে। 'এ্যাগ্র'-এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলেও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন। মিলমালিকগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, হঠাৎ হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার কারণে একদিকে যেমন উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে, অন্যদিকে 'অটো' এবং 'এ্যাগ্র'-এর Longivity কমে যাচ্ছে যা পরবর্তীতে চাউলের উৎপাদন-খরচ বাড়িয়ে তুলবে।

বিদ্যুতের সমস্যাটি স্থানীয় সমস্যা নয়; এটি একটি জাতীয় সমস্যা। তাই এর সমাধান জাতীয়ভাবেই করতে হবে। কিন্তু কত বছর পর বাংলাদেশ থেকে বিদ্যুৎ-সমস্যা দূরীভূত হবে তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। এমতাবস্থায় খাজানগরের এই প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষা এবং এর ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য বিদ্যুতের বিশেষ পৃথক লাইন করে এখানে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চত করতে হবে। খাজানগরকে 'লোড সেডিং'-এর আওতামুক্ত রাখতে হবে। সরকার আন্তরিক হলে এব্যবস্থা অনায়াসেই গ্রহণ করা সম্ভব। দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে এর তুলনা করা চলবে না। এটি সম্পর্ণ ভিন্নধর্মী প্রতিষ্ঠান। সরকার একে বিশেষ গুরুত্ব না দিলে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

খ. চাতালের সিদ্ধ করা ধান শুকানোর জন্য একমাত্র রোদের উপর ভরসা করা হয়। সিদ্ধ করা ধান রোদ ছাড়া অন্য কোন পন্থায় শুকালে চালের মান ভাল হয় না। তাই ধান শুকানোর ব্যাপারটি পুরোপুরি আবহাওয়া নির্ভর। চাতালের আঙ্গিনায় ধান শুকাতে দেয়ার পর হঠাৎ বৃষ্টি আসলে সেক্ষেত্রে সবথেকে বড় সমস্যা হল বিশাল আঙ্গিনার বিপুল পরিমাণ ধান সহসা জড় করা। একটু বিলম্ব হলেই বৃষ্টির পানিতে ধান ভিজে যায়। এভাবে বারবার ধান ভিজে গেলে তা থেকে ভাল চাউল উৎপাদিত হয় না। আবার, ধান সিদ্ধ করার পর যদি ৩/৪ দিন একাধারে বর্ষণ দেখা দেয়, তাহলে ভেজা ধান থেকে গাছ গজিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে মালিককে শুধুই লোকসান গুনতে হয়। এছাড়াও যদি দীর্ঘ দিন মেঘলা আকাশ থাকে (বৃষ্টি যদি নাও হয়) তাতেও চাউলের মান ক্ষুন্ন হয়।

উল্লিখিত সমস্যা সমাধানযোগ্য। প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকদেরকে আবহাওয়া সচেতন হতে হবে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অফিস কুষ্টিয়া-পোড়াদাহ অঞ্চলের জন্য সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য বিশেষ আবহাওয়া বার্তা প্রস্তুত করবে এবং খাজানগরের চাতাল মালিকগণ উক্ত আবহাওয়া বার্তা অনুযায়ী তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করবে। এর পরেও যদি হঠাৎ বৃষ্টি আসে তাহলে 'ক্রিকেট পিচ' যেভাবে সহসা ঢেকে ফেলা হয় সেভাবে বড় ত্রিপল দিয়ে ছড়ানো ধান ঢেকে ফেলতে হবে। কারণ ছড়ানো ধান জড় করতে অনেক সময় যায়। এক্ষেত্রে ধান শুকানোর পাকা মাঠগুলো তৈরীর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মাঠের মাঝের দিকটা যেন তুলনামূলক উচুঁ হয় যাতে ত্রিপলের উপর দিয়ে পানি গড়িয়ে সহজেই মাঠের বাইরে চলে যেতে পারে।[১৯]

গ. বর্তমানে খাজানগর হতে প্রতিবছর গড়ে ১,৯৭,৩০,৫০৪ মন[২০] চাল বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানী হচ্ছে। চালের বাজার দর হিসাবে (প্রতি কেজি ২৫ টাকা) বিচার করলে দেখা যায়, চাউলের ব্যাপারীরা খাজানগর হতে প্রতি বছর গড়ে ১৯৭৩,০৫,০৪,০০০ টাকার চাউল ক্রয় করে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে যায়। এছাড়াও প্রায় উক্ত সমপরিমাণ টাকা আন্তঃপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে লেনদেন

হয়।[২১] বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, একটি ক্ষুদ্র এলাকায় এত বিপুল পরিমাণের আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হলেও এখানে অদ্যাবধি কোন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সব আর্থিক লেনদেন চলে হাতে হাতে নগদ টাকায়। ব্যাংক-সুবিধা ভোগ করার জন্য এখানকার লোকদেরকে অনেক সময় পোড়াদাহ অথবা বটতৈল বাজারে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। এতে প্রতিবছর বহু সংখ্যক মিলমালিক ও চাউলের ব্যাপারীরা ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে। তাই এখানে যে-কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খুলে এদুর্ভোগের পরিসমাপ্তি ঘটানো দরকার। হিসাব-নিকাশ করে দেখা গেছে শুধু একটি নয় একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খুললেও এ অঞ্চলে সেগুলো প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। উল্লেখ্য যে, কোন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এখানে তাদের ব্যাংকের শাখা খুলতে চেলে মিলমালিকগণ তাদের যৌথ উদ্দোগে জমিদানসহ ব্যাংকের মূল অবকাঠামো নির্মান করে দিতে প্রস্তুত আছে।[২২]

ঘ. আগুন ও বিদ্যুৎ নিয়েই চাতাল ও মিলগুলোর কাজ-কারবার। তাই অগ্নি-নিরাপত্তা বা অগ্নি-দমনের বিষয়টি এখানে যথেষ্ট গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আগুন বা বিদ্যুতজনিত কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তা প্রতিহত করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানগুলোর একেবারেই নেই। কুষ্টিয়া শহর থেকে খাজানগরের দূরত্ব ১০ কিলোমিটার। তাই কুষ্টিয়া থেকে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলে আসতে আসতে দুর্ঘটনা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠানগুলো যৌথভাবে অগ্নি-নিরাপত্তার সরঞ্জামাদি ক্রয় করবে এবং তার যথোপযুক্ত ব্যবহার ও পরিচালনার জন্য দক্ষ বাহিনী গড়ে তুলবে। মাঝে মাঝে নিজস্ব উদ্যোগে অগ্নি নির্বাপক মহড়া (Fire drill) পরিচালনা করে বাহিনীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।[২৩] স্মরণ রাখতে হবে যে, এখানে কোন বহুতল বিশিষ্ট ভবন নেই; কাজেই অগ্নি নির্বাপনের ব্যাপক প্রস্তুতির প্রশ্নই ওঠে না।

ঙ. যে-কোন প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির জন্য শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক বড় ধরণের ভূমিকা পালন করে থাকে। খাজানগরের প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক মোটেও ভাল নয়।[২৪] শ্রমিকদের কোন কর্ম তৃপ্তি (Job satisfaction) নেই। তারা সার্বক্ষণিকভাবে চাকরি হারানোর ভয়ে থাকে। তারা চায় চাকরির নিরাপত্তা (Job security)। পূর্বে শুধু চিলমারী থেকে আগত বস্তুহারা অসহায় লোকজন খাজানগরের চাতাল ও রাইস মিলগুলোতে শ্রমিক হিসাবে কাজ নিত। কিন্তু বর্তমানে চিলমারী ছাড়াও আত্রা, নাটোর, রাজশাহী, জয়পুরহাট, নওগাঁ, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু সংখ্যক শ্রমিক কাজের উদ্দেশ্যে খাজানগরে আসে। এছাড়া আশেপাশের স্থানীয় শ্রমিক তো রয়েছেই। প্রয়োজনের তুলনায় শ্রমিকের সরবরাহ অধিক হওয়ার কারণে মিল মালিকগণ তুলনামূলক কম দামে শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করতে পারে এবং ইচ্ছে মত শ্রমিক ছাটাই করে নতুন শ্রমিক পেয়ে যায়।

প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকদের সমন্বয়ে গঠিত মালিক সমিতি এখানে খুবই শক্তিশালী। অপরদিকে, শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন সমিতি নেই। শ্রমিক সমিতি গঠিত না হওয়ার কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

- কর্মরত শ্রমিকদের অধিকাংশই ভাসমান। কতদিন এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করবে তা তারা নিজেরাই জানে না।
- বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত শ্রমিকদের মধ্যে কোন সমন্বয় নেয়। বরং তারা ভিতরে ভিতরে আঞ্চলিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত।
- শ্রমিকদের বেশীর ভাগই মহিলা। মহিলারা সাধারণতঃ কোন ঝামেলায় জড়াতে চায় না এবং তারা ঝুঁকি গ্রহণে সর্বদাই পশ্চাদমুখী।

- চাতাল শ্রমিক ও মিল শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছে শ্রেণী দ্বন্দ্ব; রয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের মৌন লড়াই। মিল শ্রমিক সব সময় দাবী করে আসছে যে, তারাই শ্রেষ্ঠ।
- শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে ভিতরে ভিতরে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করলেই মালিক তাদের দু'চার জনকে চাকুরিচ্যুত করে সমিতি গঠনের প্রক্রিয়া থামিয়ে দেয়। চাকুরি হারানোর ভয় তাদের মধ্যে প্রবল।

এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কথা চিন্তা করে শ্রমিক সমিতি গঠিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। মালিকদেরকে মনে রাখতে হবে, শ্রমিক অসন্তোষ পুষে রেখে প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি মোটেও সম্ভব নয়। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য এবং প্রতিষ্ঠানের লাগসই উন্নয়নের স্বার্থে অতি সত্তর শ্রমিক সংঘ সংগঠিত হওয়ার দ্বার খুলে দিতে হবে। এতে আসবে শ্রমিকের, মালিকের এবং সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক মঙ্গল ও উন্নতি।

৬. উপসংহার

'মাছে-ভাতে বাঙ্গালী' কথাটি সবাই স্বীকার করে। ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। তাই এক দিকে যেমন রয়েছে বেশী পরিমাণ ধান উৎপাদনের গুরুত্ব, ঠিক অন্য দিকে রয়েছে ধান প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং তা থেকে মানসম্পন্ন চাউল উৎপাদনের গুরুত্ব। ধানকে যথাযথভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যর্থ হলে চালের ফলন কম হয় এবং চাল হয় নীচু মানসম্পন্ন। তাই ধান প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজটি আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে সম্পাদিত হওয়াই সমীচীন। ইতোমধ্যেই খাজানগরের কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান 'অটো রাইস মিল' স্থাপন হয়েছে।[২৫] কিন্তু নিত্যদিনের বিদ্যুতের লোড শেডিং এহেন মহতী উদ্দোগকে সামনের দিকে আগাতে দিচ্ছে না। তাই পানি ও জ্বালানীর মাধ্যমে সৃষ্ট গ্যাসের সাহায্যে ধান সিদ্ধ করার লাগসই প্রযুক্তি হিসাবে খাজানগরের চাতালগুলো এখনও সগৌরবে টিকে আছে।

ধান সিদ্ধ করার সাথে সিদ্ধ ধান যথাযথভাবে শুকানোর বিষয়টি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তাই চাতালের পাকা আঙ্গিনাসহ অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থাপনা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির আওতায় আনতে হবে যাতে সিদ্ধ ধান কোনো অবস্থাতেই 'গুমে'[২৬] না যায়। আর্থিক লেনদেনের সুবিধার্থে খাজানগরে অতি সত্তর অন্ততঃ একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খুলতে হবে। অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে কেন্দ্রীয় অগ্নি নির্বাপক বাহিনী গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রত্যেক মিল ও চাতালের অধীনে নিজস্ব অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নয়নের জন্য এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর ভবিষ্যৎ লাগসই উন্নয়নের স্বার্থে অতি সত্তর শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে মালিকদেরকে সহানুভূতিশীল মনোভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। মালিকদেরকে বুঝতে হবে শ্রম-নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে শুধু শ্রমিকরাই লাভবান হয় না, পাশাপাশি মালিক তথা প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ লাগসই উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূরীকরণের নিমিত্তে প্রণীত সুপারিশমালা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের মধ্যদিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো অনন্য প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে এবং বাংলাদেশের চাউল উৎপাদনের জগতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. সনাতন পদ্ধতি বলতে এখানে হাঁড়ি বা কড়াইয়ে ভেজা ধান রেখে সরাসরি আগুনের তাপে সিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে।

২. গ্রামাঞ্চলে চাতাল বলতে ঘরের চালকে বুঝায়। কিন্তু খাজানগর এলাকায় ধান সিদ্ধ করার জন্য নির্মিত ঘরকে চাতাল বলে। শুধু ধান সিদ্ধ করার স্থান, এই কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম ইত্যাদিও চাতালের আওতাধীন। সিদ্ধ ধান শুকানোর জন্য বিস্তীর্ণ পাকা মাঠও চাতালের আওতায় পড়ে। এই এলাকার অনেকেই আবার চাতালকে 'খোলা' বলে। অপরদিকে, আখ মাড়াই ও রস জ্বালিয়ে গুড় তৈরী করার ঘর ও আশপাশের প্রয়োজনীয় সীমিত এলাকাকেও খোলা বলে। কিন্তু 'খাজানগরের চাতাল' বলতে খাজানগরে অবস্থিত চাতাল ও রাইস মিলগুলোকে একসাথে বুঝায়।

৩. চাতালে কর্মরত শ্রমিকদেরকে চাতাল শ্রমিক বলা হয়। চাতাল শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। তবে চাতাল মিস্ত্রী ও চাতাল ম্যানেজার সর্বদাই পুরুষ।

৪. মিলে ধান ভাঙ্গানোর কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদেরকে মিল শ্রমিক বলা হয়। মিল শ্রমিকদের অধিকাংশই পুরুষ। তবে চাল ঝাড়ার কাজে নিয়োজিত শ্রমিক সর্বদাই মহিলা।

৫. খাজানগর ও চিলমারী এলাকায় বসবাসকারীদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই অংশের যাবতীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

৬. সাক্ষাৎদানকারীগণ উল্লেখ করে যে, এই কাজে পরিবারের বয়স্ক পুরুষেরা ধান কেনা ও চাল বিক্রি কারার কাজে জড়িত থাকতো। পরিবারের মহিলা সদস্যরা ধান সিদ্ধ করা, ধান শুকানো, ঢেঁকিতে ধান ভানা এবং সেগুলো ঝেড়ে বিক্রয়ের উপযুক্ত করে দিত। পরিবারের ছোট ছেলেমেয়েরাও মহিলাদের এই কাজে সহযোগিতা করতো।

৭. এ অঞ্চলে ফেরি করে কোন কিছু বিক্রি করাকে 'গামাল করা' বলে। গামাল কথাটি এখন খাজানগর এলাকার এবং এর আশেপাশের আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত একটি শব্দ – চিলমারি এলাকায় নয়।

৮. ব্যবসার কাজে ব্যবহারের জন্য অনেকের নিজস্ব ভ্যান অথবা ঘোড়ার গাড়ী ছিল।

৯. ১৯৮০ সালে প্রগতি, ভাই ভাই, জনকল্যাণ, আল-আমীন ও সিকদার মিল নামে ৫টি রাইস মিল বসাতে এর সংখ্যা সাতে পৌঁছে।

১০. ধান ভাঙ্গানোর সময় যাতে চাল ভেঙ্গে না যায় সেজন্য বিশেষ পদ্ধতিতে পানি ও উত্তাপের দ্বারা সৃষ্ট গ্যাসের সাহায্যে ধান গরম করার প্রক্রিয়াকে 'ভাব দেয়া' বলে। 'ভাব' শব্দটি সম্ভবত 'ভাপ' বা vapour থেকে এসেছে। ভাব দেয়াকে আবার অনেকেই 'উছানো' বলে। সিদ্ধ কারার আগে এই প্রক্রিয়ায় ধানে তাপ প্রয়োগ করা হয় বলে একে অনেকেই আবার 'প্রথম বারের সিদ্ধ'ও বলে থাকে।

১১. সাক্ষাৎকার প্রদানের সময় মহিলা শ্রমিকেরা অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, তারা রাইস মিলের অন্যান্য কাজ অপেক্ষা চাতালের কাজেই বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। চাতালের যাবতীয় কাজ একমাত্র মহিলাদেরই মানায় বলে তারা দাবী করে।

১২. বৃষ্টি আসলে অতি তাড়াতাড়ি ধান ঘরে ওঠানোর ব্যবস্থা করা হয় অথবা ত্রিপল বা বড় 'পানি কাগজ' দিয়ে ডেকে দেয়া হয়। ছাড়ানো ধান দ্রুত গোছানোর জন্য কাঠের তৈরী বড় 'পঠসারা' ব্যবহৃত হয়। তিন-চার জন মহিলা শ্রমিক এই পঠসারা টেনে ধান জড় করে।

১৩. পানির ব্যারলের সম্পূর্ণ অংশ পানি দিয়ে পূর্ণ করা হয় না যাতে পাইপের মধ্য দিয়ে পানি উঠে না আসে। চাতাল মন্ত্রীদের কাছ থেকে এই তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। তারা আরো বলেছে যে, পরিমাণ মত তুষ ব্যবহার করে এমনভাবে উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে গ্যাসের অপচয় না ঘটে।

১৪. চামচটি টান দিয়ে বের করে ফেললেই ব্যারল থেকে সম্পূর্ণ ধান আপন গতিতে বের হয়ে আসে। ভাব দেয়া বা সিদ্ধ করা ধান খালি করার পর চামচটি আবার যথাস্থানে লাগিয়ে দেয়া হয় যাতে ওপর থেকে ধান ঢাললে তা নীচ দিয়ে বেরিয়ে না যায়।

১৫. ধান সিদ্ধ করার আগে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখা দরকার হয়। ধান ভিজিয়ে রাখার জন্য চাতালের এক স্থানে ইট ও সিমেন্ট দিয়ে কমপক্ষে দু'টি বড় পুকুর (প্রতিটিতে কমপক্ষে ১৪০ মন ধান ধরে এমন) তৈরী করা হয়। প্রত্যেক চাতালে কমপক্ষে দু'টি পুকুর থাকার কারণ হলো, যখন একটি থেকে ধান নিয়ে সিদ্ধ করা হবে তখন অন্যটির ধান ভিজতে থাকবে।

১৬. চাতালের কার্যক্রম বিদ্যুতের সাথে সম্পর্কিত নয়; বরং আবহাওয়ার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। অতিবৃষ্টি এবং মেঘলা আবহাওয়া চাতালের কাজকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। ধান সিদ্ধ করার পর যদি তা সঠিক সময়ে যথাযথভাবে রোদে শুকানো সম্ভব না হয় তাহলে সেই ধান থেকে মানসম্মত চাল পাওয়া যায় না। তবে রাতে চাতালের কোন কাজ পরিচালনার জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন আছে।

১৭. প্রতিটি 'অটো'-তে ২৪ ঘন্টায় চার হাজার মন ধান ভাঙ্গানো সম্ভব। 'অটো'-তে ধান ভাঙ্গানো হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাল বাছাইয়ের যাবতীয় কাজগুলো অতি সুনিপুনভাবে সম্পন্ন হয়। ধান ভাঙ্গানোর এই 'অটো'-গুলো চীন এবং মালোয়েশিয়ার তৈরী।

১৮. সব ধানই 'অটো'-তে ভাঙ্গানো হয় না। যেসব ধান সনাতন পদ্ধতিতে মিলে ভাঙ্গানো হয় সেই ধান থেকে উৎপাদিত চাউল মানসম্মত করার জন্য 'এ্যাগ্র'-তে বাছাই করা হয়। 'এ্যাগ্র'-এর কাজ হল, কালো চাউল আলাদা করা; খুদ, কুন প্রভৃতি বেছে ফেলে মানসম্মত চাল উপহার দেয়া। অপরদিকে, 'অটো' স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'এ্যাগ্র'-এর কাজগুলোও করে। যেদিন খাজানগরের সব চালই 'অটো'-তে ভাঙ্গানো হবে সেদিন আর 'এ্যাগ্র'-এর ব্যবহার থাকবে না।

১৯. উন্নত বিশ্বের ক্রিকেট মাঠ তৈরীর অভিজ্ঞতা ও কৌশল এখানে কাজে লাগাতে হবে। তাছাড়া ত্রিপল দিয়ে দ্রুত ধান ডেকে ফেলার জন্য দক্ষ কর্মীবাহিনী (ট্রেনিং-এর মাধ্যমে) গড়ে তুলতে হবে।

২০. ৪০ সেরে এক মন হলেও বর্তমানে ৪০ কেজিতে এক মন হিসাবে এখানকার যাবতীয় কারবার চলে।

২১. মিলমালিকদের পুরাতন ও নতুন খাতা-পত্র থেকে এই পরিসংখ্যানিক তথ্য উদ্ঘাটন করা হয়েছে।

২২. খাজানগরের মিলমালিকগণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে উক্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

২৩. দুর্ঘটনার সময় যাতে অগ্নি নির্বাপক বাহিনী ধারে-কাছেই যথেষ্ট পরিমাণ পানি পায় তার জন্য পূর্বেই কিছু সংখ্যক জলাধার তৈরী করে রাখতে হবে। জলের পাশাপাশি যথেষ্ট পরিমাণ বালিও মজুদ রাখতে হবে; কারণ অগ্নি নির্বাপনের ক্ষেত্রে বালি দারুন সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

২৪. আমাদের দেশের গার্মেন্টস শিল্পেও শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ভাল নয়। তাই ইদানিং গার্মেন্টস শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রমিক অসন্তোষ লেগেই আছে। এমন কি প্রায়ই জ্বালাও-পোড়াও ঘটনার মত দুঃখজনক ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়। খাজানগরের অবস্থাও দিন দিন সেদিকেই যাচ্ছে।

২৫. মোট উৎপাদিত চাউলের মাত্র শতকরা ১২ ভাগ চাউল 'অটো রাইস মিল' থেকে উৎপাদিত হয়। বিদ্যুতের সার্বক্ষণিক নিশ্চয়তা বিধান করতে পারলে সব মিলমালিকই 'অটো রাইস মিল' স্থাপন করবে এবং তখন সব চাউলই আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত হবে। প্রত্যেক মিলমালিকেরই 'অটো রাইস মিল' স্থাপন করার আর্থিক সামর্থ আছে।

২৬. সিদ্ধ ধান যথাসময়ে শুকাতে ব্যর্থ হলে ধানে অঙ্কুর গজিয়ে যায় এবং চাউলের রং হয় লালচে। এমন ধানকে স্থানীয় ভাষায় গুমে যাওয়া ধান বলে। গুমে যাওয়া ধানের চাল কেউ কিনতে চায় না।